শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিযাহুল্লাহ) এর ধারাবাহিক নতুন দাওয়াহ সিরিজ

[১ম পর্ব]

"আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ"

অনুবাদ ও পরিবেশনা

بسمِ اللهِ والحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ وآلِه وصحبِه ومن والاه.

সর্বত্র অবস্থানরত আমার মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ.

এ পর্বে আমি নতুন ও পুরাতন বস্তুবাদীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। এ আলোচনার টার্গেট হবে ইসলাম ও ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস বিরোধীরা। মূল টার্গেটে থাকবে, নাস্তিক্যবাদের প্রতি আহ্বানকারীরা।

মানব ইতিহাসে নাস্তিকতা একটি পুরাতন বিষয়। সে কথার ইঙ্গিত কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে রয়েছে। যেমনটা ইসলামের মনিষীগণ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নাস্তিক্যবাদের প্রচারকদের জবাবও দিয়ে এসেছেন। নাস্তিকতা পুরাতন হওয়া সত্বেও সূচনা থেকেই বিভিন্ন রূপ ও আকৃতি ধারণ করেছে। তথাপিও তার বাস্তবতা কিন্তু এক ও অভিন্ন-ই থেকেছে। আর তা হলো: আল্লাহর নাযিলকৃত মানহায বা আদর্শ থেকে সরে যাওয়া।

এখানে আমি এ বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, কুরআনুল কারীমে নাস্তিকতার যে বিবরণ এসেছে, তা মানুষের জানার পরিধির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বিশেষকরে বর্তমান যুগে। মানুষের জানা মতে, নাস্তিকতা হচ্ছে- মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। অথচ কোরআনে বর্ণিত নাস্তিকতা এর চেয়েও ব্যাপক। ইসলামের আকিদা ও নীতি থেকে সব ধরণের বক্রতাই হচ্ছে নাস্তিকতা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মসজিদে হারাম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ الحج: ٢٥

“যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রানাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।” (সূরা হাজ্জ: ২৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্যত্র আরো ইরশাদ করেছেন-

﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الأعراف: ١٨٠

“আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা আল্লাহর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।” (সূরা আ'রাফ: ১৮০)

আভিধানিক অর্থে নাস্তিকতা হচ্ছে, এক পাশে সরে যাওয়া, মৌলিক বিষয়কে ত্যাগ করা। আমাদের যুগে নাস্তিকতাকে মৌলিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

এক: অস্বীকারমূলক নাস্তিকতা। তা হচ্ছে, মানুষের মাঝে প্রচলিত নাস্তিকতা, যা দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

দুই: শিথিলতামূলক নাস্তিকতা। তা হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিছু সিফাত/গুণকে অস্বীকার করে গাইরুল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করা। আমাদের যুগে এর স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা। যা শরীয়াহ বিরোধী আইন দিয়ে বিচার করে, আর দাবী করে যে, এটা শাখাগত ধর্ম নিরপেক্ষতা, এটা ধর্মের সীমা অতিক্রম করে না। কিন্তু এখানে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটি নামের অপব্যাখ্যা করে তাঁর একটি গুণবাচক নামকে অকেজো সাব্যস্ত করছে। সে গুণটি হল বিধানদাতা। অথচ আল্লাহই হচ্ছেন প্রকৃত বিধানদাতা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ... ﴿الشورى: ١٠﴾

“তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ।” (সূরা শূরা: ১০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

قال رسول الله ﷺ:"إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ" أخرجه النسائي، وصححه الألباني. إرواء الغليل ج: 8 ص: 355

“আল্লাহ-ই বিধানদাতা।”(সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং- ৫৪০২,শামেলা)

শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (ইরওয়াউল গালিল, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৫৫)

অস্বীকারমূলক নাস্তিকতা পুরো মানব ইতিহাসে অতি অল্প। অবশ্য কমিউনিজমের পতনের পর থেকে এ যুগে তাদের অবস্থা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ভ্রান্তদের চেয়ে শিথিলকারী নাস্তিকদের সংখ্যা অনেক বেশি। আর নবী-রাসূল ও তাওহীদবাদীদের বেশির ভাগ যুদ্ধ এদের সাথেই হয়েছে।

আজ আমি অস্বীকারমূলক নাস্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহর তাওফীক ও ইচ্ছায় আমার আলোচনাকে তিন পর্বে ভাগ করব। যথা-

প্রথম পর্ব: অস্বীকারকারী নাস্তিকদের সরল সংক্ষিপ্ত জবাব। এটি তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় পর্ব: অস্বীকারমূলক নাস্তিকতা প্রতিরোধের বিভিন্ন রূপ।

তৃতীয় পর্ব: মুসলিমদের মাঝে নাস্তিকতা ছড়ানোর জন্য রাজনৈতিক বিভিন্ন লক্ষ্য।

প্রথম পর্ব: অস্বীকারকারী নাস্তিকদের জবাব

এ পর্বে আমি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তাকারে ও সরলভাবে তাদের জবাব নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। কারণ আলেমগণ এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মের অনেক পণ্ডিতও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

যেহেতু মানব স্বভাবে নাস্তিকতা অপসারণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাই অধিকাংশ মানুষই তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

আল্লাহর তাওফীক ও ইচ্ছায় এ পর্বেও আমার আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করব। যথা-

এক: অস্বীকারকারী নাস্তিকদের আকীদা প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে।

দুই: তাদের আকীদার অপরিহার্য কিছু বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

তিন: এক সময় যারা মুরতাদ হয়েছিল, পরে তওবা করে ইসলামে ফিরে এসেছে, এমন খ্যাতিমান নাস্তিকদের নির্বাচিত কথার মাধ্যমে তাদের জবাবের ব্যাখ্যা প্রদান।

***

অস্বীকারকারী নাস্তিকদের আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন করার আগে সংক্ষিপ্তাকারে আমি তাদের আকীদা-বিশ্বাসের সারনির্যাস কি? তা উল্লেখ করছি।

তাদের আকীদা-বিশ্বাসের সারনির্যাস হল, বিদ্যমান জগত- যাকে তারা পদার্থ বলে- এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তারকারী। তাদের মতে পদার্থ হচ্ছে, ওজন বিশিষ্ট বর্ধনশীল দেহ, যা ভরাট খালি নয়। এটিই সকল বস্তু ও বস্তুর উপাদানের মৌলিক সংগঠক।

এ পদার্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবে তার প্রতিফলন আছে। অস্তিত্বে ও প্রভাব বিস্তারে এ পদার্থই সর্বপ্রথম। তাদের বিশ্বাস এর মাঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তারকারী গুণ রয়েছে। এ কারণেই এ মতবাদ তার সকল অনুসারীকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অস্তিত্ব অস্বীকারকারী নাস্তিক বানিয়ে দিয়েছে। তারা বলে, এই পদার্থের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। কারণ তাদের দৃষ্টিতে পদার্থই প্রথমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার এই অস্তিত্ব ও অবয়ব থেকে সকল সৃষ্টি ও জীবজন্তু কেবল আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এরপর এক লক্ষ্যহীন পানে ছুটে চলছে। কর্মের ধারাবাহিকতা ও এলোপাথাড়ি কর্মের মাধ্যমে তা যেখানে পৌঁছার সেখানে পৌঁছে গেছে। এরাই ঐ সকল লোক, যারা আলেমদের কাছে যুগবাদী বলে পরিচিত।

যেমন, জুলিয়ন হাক্সলি বলেছে:

যদি ছয়টি বানর কম্পিউটারের সামনে বসে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর যাবত কী-বোর্ডে আঘাত করতে থাকে, তাহলে হয়ত বানররা যে পৃষ্ঠগুলো লিখেছে, তার শেষ পৃষ্ঠায় আমরা শেক্সপিয়রের একটি কবিতা পেতে পারি। ঠিক তদ্রূপ বিদ্যমান এ জগত হচ্ছে ফলাফলের দিক থেকে কতগুলো লক্ষ্যহীন কর্মের ফল। যা পদার্থের মাঝে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে আবর্তিত হচ্ছে।

প্রখ্যাত দার্শনিক নাস্তিক বারট্রান্ড রাসেল এ ঘৃণ্য, পরিত্যক্ত ও বিবেকহীন দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে ব্যক্ত করেছে:

মানুষ হচ্ছে কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্যহীন কর্মের ফল। মানুষের শুরু, ক্রমোন্নতি, তার আশা, ভয়, ভালোবাসা ও বিশ্বাস- সবকিছুই এসেছে জাগতিক ব্যবস্থায় আকস্মিকভাবে ঘটা গাণিতিক বিন্যাসের ফল হিসেবে। কবর মানুষের জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। কোন শক্তিই তাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করতে পারবে না। এসব সুদীর্ঘ শ্রম, কুরবানি, সুন্দর সুন্দর চিন্তা, মহা বীরত্ব- সবকিছু শীঘ্রই জগতের ভগ্নাবশেষের নিচে চাপা পড়ে যাবে। যদি আবশ্যিকভাবে এসব চিন্তা

না থাকত, তবে অতি নিকটেই সে পরিণতি বাস্তবতায় রূপ নিত। এমন কি যে দর্শনই তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করত। অনতিবিলম্বে সে দর্শনই ধ্বংসের মুখে থুবরে পড়ত।

এর মাধ্যমে সে বস্তুবাদী চিন্তার সারাংশ বিষয়গুলো স্পষ্ট করেছে। সুতরাং এ জগতের কোন উদ্দেশ্য নেই। এখানে ভালো মন্দের সকল মাপকাঠিই বিলীন হয়ে যাবে। এমনকি বোম্বিংয়ের মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংস করাও জুলুম বলে গণ্য হবে না। কারণ অচিরেই একদিন যে কোন অবস্থায় তারা নিজেদের নিঃশেষ হওয়া প্রত্যক্ষ করবে।

এ বিষয়ে আমি অস্বীকারমূলক নাস্তিকতার আলোচনায় ইঙ্গিত করব, ইনশা আল্লাহ।

এভাবে ধর্মহীন বস্তুবাদী মতবাদ ডারউইনের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতি দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যদিও ডারউইন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অস্তিত্ব অস্বীকার করত না কিন্তু সে মনে করত মানুষের ক্রমবিকাশ একেবারেই শূন্য জগত থেকে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। তার এ কথা আল্লাহর অস্তিত্ব না মানার ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

এ ক্রমবিকাশ লক্ষহীনভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আর সর্বাধিক শক্তিমান সৃষ্টি ও আকার ধারণে সক্ষম বস্তুর জন্য স্থায়িত্ব পেয়েছে। যা জগতের অন্য বস্তুর সাথে সংঘর্ষের পর স্থায়িত্বে আসতে সক্ষম হয়েছে। আর আকার ধারণ প্রাকৃতিক কর্মের সঙ্গে এসেছে।

কুরআনুল কারীমে অস্বীকারকারী নাস্তিকদের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿الأنعام: ٢٩﴾

"তারা বলেঃ আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না।" (সূরা আন'আম: ২৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন-

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿الجاثية: ٢٤﴾

“তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।” (সূরা জাছিয়া: ২৪)

কিন্তু কুরআনের বড় বড় যুদ্ধ শিরকের সাথেই হয়েছে। কারণ নাস্তিকতা হচ্ছে পরবর্তীতে আপতিত বিষয় এবং মানব ইতিহাসে তা তুলনামূলক কম। তাই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারীভাবে নাস্তিকতাকে লালন করত, সে সোভিয়েত ষাট বছর পর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আর চীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল। তাছাড়া এ বিষয়ে ওয়ারসোর বিখ্যাত চুক্তিপত্রটিও লাইব্রেরীর তাকেই পড়ে রইল। সোভিয়েতের সিংহভাগ অংশই গিয়ে মিলিত হল ন্যাটোর সাথে ।

নির্বাককারী চূড়ান্ত জবাবের মাধ্যমে কুরআনুল কারীম অস্বীকারকারী নাস্তিকদের খণ্ডন করেছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরো ইরশাদ করেছেন-

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿الطور: ٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿الطور: ٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿الطور: ٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿الطور: ٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿الطور: ٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿الطور: ٣٥﴾أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿الطور: ٣٦﴾

“তারা কি বলতে চায়ঃ সে একজন কবি আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি। বলুনঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি। তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? না তারা বলেঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী। যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক। তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। (সূরা তূর: ৩০-৩৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরো ইরশাদ করেছেন-

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿الواقعة: ٥٨﴾ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿الواقعة: ٥٩﴾

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে। তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?" (সূরা ওয়াক্বিয়া: ৫৮-৫৯)

এসব আয়াতে কুরআনুল কারীম অক্ষমকারী চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে তাদের মত খণ্ডন করেছে।

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿الطور: ٣١﴾

"বলুনঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি।"(সূরা তূর:৩১)

উল্লেখিত এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের দৃষ্টির বাইরে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আর তাঁর চ্যালেঞ্জকৃত বিষয় সংঘটিত হয়ে গেছে। ইসলাম বিজয়ী হয়েছে, শিরক পরাস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে ইরশাদ করেছেন-

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿الطور: ٣٤﴾

"যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক।" (সূরা তূর: ৩৪)

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হতভম্বকারী বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের আলোকে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে ইরশাদ করেছেন-

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿الطور: ٣٥﴾

"তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?" (সূরা তূর: ৩৫)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿الواقعة: ٥٨﴾ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿الواقعة: ٥٩﴾

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে। তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?" (সূরা ওয়াক্বিয়া: ৫৮-৫৯)

সুতরাং বুঝা গেল সত্য জানার পন্থা একাধিক। যথা-

এক. অহীর মাধ্যমে জানা, যা (মু'জিযার মাধ্যমে) বিস্ময়করভাবে প্রমাণিত। আর এ পন্থাই সর্বোত্তম।

দুই. দলিলের আলোকে ঐ স্বভাব প্রকৃতির মাধ্যমে জানা, যে স্বভাব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানব মনে প্রোথিত করেছেন।

তিন. আল্লাহর সৃষ্টি-জীব, তার ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম নীতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার মাধ্যমে জানা।

চার. আক্বলী (বুদ্ধিবৃত্তিক) দলিলের মাধ্যমে জানা।

তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, মন ও হৃদয় প্রশান্তকারী বিশ্বাস কেবল সে ব্যক্তিই পেতে পারে, যে অহীর অনুসরণ করবে।

আর আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ এনেছি শুধু সত্য জানার পথসমূহ চেনার জন্য এবং মনের কুমন্ত্রণা ও সংশয় দূর করে বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডনের জন্য।

কিন্তু মনের তৃপ্তি, প্রশান্তি ও সন্তুষ্টির জন্য দয়াময় রবের অহীর অনুসরণ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। যে অহী তিনি তাঁর নবী রাসূলদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মাঝে সর্বশেষ ও সর্বোত্তম নবী হচ্ছেন আমাদের প্রিয়তম পথ প্রদর্শক, সর্দার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।

যার সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ... ﴿النور: ٥٤﴾

"তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে।" (সূরা নূর: ৫৪)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿الأعراف: ١٥٧﴾

"সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।" (সূরা আ'রাফ: ১৫৭)

প্রত্যেক ব্যক্তি, হোক সে আস্তিক বা নাস্তিক, তার জন্য আবশ্যক হল, আল্লাহর তরফ থেকে অহীর অবতরণ প্রমাণিত হলে তা স্বীকার করা এবং অনুসরণ করা।

এজন্য যখন কোন নাস্তিক এসে বলে যে, আমি ইসলাম বা অন্য কোন ধর্মে পরিতৃপ্ত নই। কারণ ধর্ম জুলুম, কঠোরতা ও অপছন্দনীয় বিষয়ের উপর বাধ্য করে। তো এ ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে বিদ্রূপ করেছে, বিবেক দিয়ে চিন্তা করেনি।

কারণ একজন বিবেকবান মু'মিনের কাছে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ পৌঁছে, তখন সে বলে, আমি শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

আর বুদ্ধিজীবী নাস্তিক কোন ধর্মের প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করবে না এটাই স্বাভাবিক। কারণ সে তো ধর্মের প্রবক্তাকেই বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করলে তো তার কথা মত চলতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে ঐশী বাণীই কেবল মানুষের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। আর যারা নিজের বিবেকের কারণে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে বিবেকই তাদের অপরিহার্য জ্ঞানের পথ দেখাবে। কারণ প্রত্যেকেরই বিবেক রয়েছে, যা তাকে অপরিহার্য জ্ঞানের সন্ধান দেয়।

আল্লাহর সাহায্যে আমি সংক্ষিপ্তাকারে অস্বীকারমূলক নাস্তিকতার খণ্ডন এই বুদ্ধিবৃত্তিক, স্বভাবজাত ও অক্ষমকারী দলীলের মাধ্যমে করব, ইনশা আল্লাহ।

প্রথমে আমি বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল দিয়ে খণ্ডন শুরু করতে যাচ্ছি৷ যাতে অস্বীকারকারী নাস্তিকরা বলতে না পারে যে, আমি যুক্তি থেকে পলায়ন করেছি। অথবা তারা যে অহীকে অস্বীকার করে, আমি সে অহীকেই তাদের বিপক্ষে দাঁড় করাচ্ছি। যদিও অহীর দলীলই তাদের জন্য উপযুক্ত জবাব। যা আমি বর্ণনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আকলী (বুদ্ধিবৃত্তিক) দলিলগুলো হচ্ছে-

প্রথম যুক্তি: এই জগতে বিরাজমান প্রতিটি বস্তুরই একটি শুরু এবং শেষ আছে। হোক তা জীব বা জড়বস্তু। সুতরাং এই নক্ষত্রগুলো সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয় অথবা বিস্ফোরিত হয়। আর এই তরুলতা, গাছপালা ও মানুষ সৃষ্টি হয় তারপর মরে যায়। এই সূর্য ক্রমান্বয়ে উদ্ভাসিত হয়, এরপর তার সাথে নক্ষত্রসহ নিজস্ব ব্লক থেকে বহু মিলিয়ন টন সংকুচিত হয়ে যায়।

আর স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, এগুলোর কোনটিই নিজেকে সৃষ্টি করেনি। তার অবশ্যই একজন অস্তিত্ব দানকারী আছে। সুতরাং প্রত্যেক অস্তিত্বমান বস্তুরই একজন অস্তিত্ব দানকারী আছে। তাই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿الطور: ٣٥﴾

"তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?" (সূরা তূর: ৩৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন-

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿الواقعة: ٥٨﴾ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿الواقعة: ٥٩﴾

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে। তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?" (সূরা ওয়াক্বিয়া: ৫৮-৫৯)

আর বিবেক এটা মানতে পারে না যে, প্রতিটি অস্তিত্বমান বস্তুই অনন্তকাল থাকবে এবং এটাও মানতে পারে না যে, তা একেবারেই অস্তিত্বহীন ছিল।

তাহলে অবশ্যই একজন প্রথম অস্তিত্ব দানকারী আছে, যাকে অন্য কেউ অস্তিত্ব দান করেনি। আর তিনিই হচ্ছেন মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। যিনি স্বত্ত্বাগতভাবেই অস্তিত্বশীল। অস্তিত্বে আসার জন্য তিনি করো মুখাপেক্ষী নন। অথবা অবিনশ্বর সত্তা মহান আল্লাহ তেমনই, যেমনটা তিনি নিজের সম্পর্কে الْقَيُّومُ তথা "তিনি সবকিছুর ধারক" বলেছেন। এ মর্মে তিনি ইরশাদ করেছেন-

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ...﴿البقرة: ٢٥٥﴾

"আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক।" (সূরা বাকারা: ২৫৫)

দ্বিতীয় যুক্তি: অস্তিত্বমান প্রত্যেকটি বস্তুই অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সম্ভাবনা রাখে। বিষয়টা এভাবে বুঝতে পারি, যদি অমুক ব্যক্তির বাবা মা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হত, তবে সে অস্তিত্বে আসত না, অনস্তিত্বে থেকে যেত। তাহলে সে অস্তিত্বে আসার বা না আসার দুটোরই সম্ভাবনা ছিল।

আর অস্তিত্বে আসার সম্ভাবনা রাখে, এমন প্রত্যেক বস্তুই একজনের মুখাপেক্ষী, যিনি তার অনস্তিত্বের উপর অস্তিত্বকে প্রাধান্য দিবেন। আর বিবেক এটা অস্বীকার করে যে, অমুক ব্যক্তি এমন, যে নিজেই নিজের অস্তিত্ব দান করেছে। কারণ এ পদ্ধতিটি দাবী করে, সে অস্তিত্বে আসার আগেই অস্তিত্বশীল ছিল, যেটা পরস্পর বিরোধী। তাহলে প্রথম একজন অস্তিত্ব দানকারী থাকবে, যার অস্তিত্বশীল হওয়া অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ তিনি নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। আর তিনিই হচ্ছেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা, যিনি সত্তাগতভাবেই অবিনশ্বর। যার অস্তিত্বের আগে কোন অস্তিত্বের অস্তিত্ব ছিল না। তার অস্তিত্ব কোন সম্ভাবনাময় ছিল না, বরং তা আবশ্যকভাবেই অবধারিত ছিল।

তৃতীয় যুক্তি: প্রতিটি অস্তিত্বমান বস্তুই অস্তিত্বে আসার জন্য কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী হয়, যে তাকে অস্তিত্বে নিয়ে আসবে। সুতরাং গাছ-পালা, তরু-লতার অস্তিত্বের জন্য বীজ হচ্ছে মাধ্যম। আর বীজের পূর্বের ফলটি হচ্ছে ঐ বীজটি অস্তিত্বে আসার মাধ্যম। এভাবে একটি আরেকটির মাধ্যম হওয়ার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে- প্রত্যেক অস্তিত্বমান বস্তু অস্তিত্বে আসার পিছনে অন্য কোন মাধ্যম অথবা কারণ থাকে।

বিবেক এটা মেনে নেয় না যে, অস্তিত্বমান বস্তুটি একটি শুরু এবং একটি সমাপ্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ। এটাও মেনে নেয় না যে, অস্তিত্বে আসার বা না আসার সম্ভাবনাময় বস্তুটি নিজেই তার অস্তিত্বে আসার মাধ্যম। আবার বিবেক এটাও মেনে নেয় না যে, অস্তিত্বমান বস্তুগুলোর কোন প্রাথমিক মাধ্যম নেই। তাহলে বুঝা গেল, একটি প্রাথমিক কারণ বা মাধ্যম থাকা আবশ্যক, যা নিজে অস্তিত্বে আসার জন্য ঐ মাধ্যম থেকে অমুখাপেক্ষী থাকবে, যা তাকে মাধ্যম বানাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ইরশাদ করেছেন-

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿الحديد: ٣﴾

“তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।” (সূরা হাদীদ: ৩)

চতুর্থ যুক্তি: এই অস্তিত্বমান বস্তুগুলো এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। যেমন শিশু ছোট হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তারপর পর্যায়ক্রমে সে বার্ধক্যে উপনীত হয়। তার এ পরিবর্তন কে ঘটাল? এটা তো স্পষ্ট যে, সে নিজেই নিজের পরিবর্তন ঘটায়নি। তাহলে কে তাকে পরিবর্তন করল? আবার তার পরিবর্তনকারীকে কোন সত্তা পরির্বনতন করল? এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে থাকবে। সুতরাং বিবেক এটা মেনে নিবে না যে, সেখানে একজন প্রথম হস্তক্ষেপকারী নেই। সুতরাং বুঝা গেল যে, বিশ্বজগতের মাঝে এমন একজন হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণকারী আছে, যার মাঝে কেউ হস্তক্ষেপ করেনি। আর তিনিই হচ্ছেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ইরশাদ করেছেন-

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿الأنعام: ١٠١﴾

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿الأنعام: ١٠٢﴾

“তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গী নেই ? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।” (সূরা আন‘আম: ১০১-১০২)

একটু সহজ ও স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আমি পূর্বের আলোচনাকে আলাপচারিতার মত করে আনছি।

তুমি জানো যে, তুমি নতুন করে সৃষ্ট। তুমি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছ। সুতরাং হয়তো তোমাকে কোন অস্তিত্ব দানকারী ছাড়াই ‘নিরেট শূন্যতা’ অস্তিত্ব দিয়েছে অথবা অন্য কোন বস্তু তোমাকে অস্তিত্বে এনেছে।

আর এটা অসম্ভব যে, কোন অস্তিত্ব দানকারী ছাড়া ‘নিরেট শূন্যতা’ তোমাকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছে। তাহলে তোমার জন্য একজন অস্তিত্ব দানকারী থাকতে হবে।

আর এই অস্তিত্ব দানকারী হয়তো তুমি নিজেই হবে অথবা অন্য কেউ হবে। আর এটা অসম্ভব যে, তুমি সেই ব্যক্তি যে নিজেকে নিজে অস্তিত্ব দান করেছে। অর্থাৎ তুমি আবশ্যিকভাবে অস্তিত্বে আসার আগেই অস্তিত্বমান ছিলে। এটা পরস্পর বিরোধী কথা। যা মুহূর্তেই বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল তোমার অস্তিত্ব দানকারী ভিন্ন কেউ হওয়া আবশ্যক।

আর এই ভিন্ন ব্যক্তি হয়তো আরেকজন অস্তিত্ব দানকারীর মুখাপেক্ষী হবে অথবা হবে না। আর এটাও সম্ভব নয় যে, সে তোমার মত অন্যের মুখাপেক্ষী হবে। কারণ এতক্ষণ তোমার ব্যাপারে যা বললাম তার পুরোটাই তার উপর আরোপিত হবে। তাহলে বুঝা গেল অস্তিত্ব দানকারী হতে হবে অবিনশ্বর, সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ স্বত্তাগতভাবে বিদ্যমান, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কোন অস্তিত্ব দানকারীর প্রতি একেবারেই অমুখাপেক্ষী। আর তিনিই হচ্ছেন সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা, যিনি চিরঞ্জীব অবিনশ্বর।

পঞ্চম যুক্তি: যারা মনে করে এই জগত আকস্মিকভাবে অস্তিত্বে এসেছে কিছু পদার্থ পরস্পরে ক্রিয়াশীল হওয়ার মাধ্যমে। যা নির্দিষ্ট কিছু সময়, নির্দিষ্ট সম্পর্ক ও নির্দিষ্ট পাত্রে বিদ্যমান ছিল। অনুরূপভাবে জীবনও কিছু পদার্থের পারস্পরিক ক্রিয়াশীল হওয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। যা নির্দিষ্ট কিছু পাত্রে বিদ্যমান ছিল। এরপর আকস্মিকভাবে তা অস্তিত্বে এসেছে।

আমি তাদেরকে বলব-

আকস্মিক শব্দটি শুধুই বিশেষণ বুঝানোর জন্য, তা পূর্বের প্রশ্নসমূহের জবাব দিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, তুমি পথে বের হলে, কিছু দূর যাওয়ার পর কোন প্রতিশ্রুতি কিংবা পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এক পুরাতন বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হল। এটা একটা সম্ভাবনাময় বিষয়। ভিন্ন কারো সাথেও তো সাক্ষাত হতে পারত, তাকে তুমি চেনো বা না চেনো। তার সাক্ষাতের আয়োজন কর বা না কর।

যাই হোক, তো সেই ব্যক্তি কে? যিনি এই সময়ে এই স্থানে তোমার এ বন্ধুর মিলন ঘটাল? বরং তুমি যখন সেই সময়টাতে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে তুলনা করবে, অর্থাৎ অন্য একটি সম্ভাবনাকে ধরে নিবে, তখন প্রশ্ন হবে এই অন্য সম্ভাবনাকে কে বাস্তবায়ন করল। এভাবে “কে” শব্দযোগে উত্তরবিহীন প্রশ্ন চলতেই থাকবে। আর “কে” শব্দকে নাস্তিকরা অপছন্দ করে।

এর পরের কথা হচ্ছে, এ বিশ্বজগত যখন এক বিগ ব্যাঙের (মহা বিস্ফোরণের) মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে, তাহলে এই বিগ-ব্যাঙ অস্তিত্বে আসার পিছনে কে আছে? আনুপাতিক হারে অপরিহার্য পদার্থগুলো কে সৃষ্টি করেছে, যেগুলো ঐ বিগ-ব্যাঙের জন্য প্রয়োজনীয় মূহূর্তে আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে?

এর উত্তরে যদি নাস্তিকরা বলে, জানিনা। তাহলে বলব, কিভাবে জানলে, এ জগত বিগ ব্যাঙের মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে?

যদি বলে, এ বিগ ব্যাঙকে তার পূর্বের বিগ-ব্যাঙ অস্তিত্ব দিয়েছে। উত্তরে আমরা বলব, তাহলে তো বিপুল পরিমাণে বিগ-ব্যাঙ থাকতে হবে? তখন প্রতিটি পদার্থ একটি করে বিগ ব্যাঙ সৃষ্টি করেছে। এভাবে তাপ, চাপ, সঞ্চলন, স্থান, সময়, গতি এবং চলার দিক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রতিটি অবস্থাকে একটি বিগ ব্যাঙ সৃষ্টি করেছে। তারপর আরেকটি বিগ ব্যাঙ এসে এ সকল বিগ ব্যাঙকে একত্রিত করেছে। তারপর কি অপর একটি বিগ ব্যাঙ এসে সকল বিগ ব্যাঙকে পরস্পরের সাথে ক্রিয়াশীল করেছে?

তাহলে তো এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে থাকবে- বিগ ব্যাঙের বিগ ব্যাঙকে কে সৃষ্টি করেছে? যদি তাকে আরেক বিগ ব্যাঙ সৃষ্টি করে, তাহলে তাকে আবার কে সৃষ্টি করেছে? এভাবে অনর্থক প্রশ্নের ধারা চলতে থাকবে।

ঐ নাস্তিকদেরকে আমরা বলব, আমরা শুধু তোমাকে এ প্রশ্ন করব না যে, বিগ ব্যাঙের অবস্থাগুলো কিভাবে সঞ্চিত হল? বরং গায়ে পড়ে এ প্রশ্নও করব যে, শেষে ঐ বিগ ব্যাঙকে কে অস্তিত্বে নিয়ে আসল? কে সে? যিনি ঐ বিগ ব্যাঙ অস্তিত্বে আসার কারণ? ঐ অবস্থা ও

পদার্থগুলো কি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে, যা বিগ ব্যাঙকে সঞ্চয় করেছে? নাকি সেগুলোকে একজন অস্তিত্ব দান করেছে???

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই সত্য বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿الطور: ٣٥﴾

“তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?” (সূরা তূর: ৩৫)

যে জুলিয়ন হাক্সলি লিখন-যন্ত্র (কম্পিউটার) ও ছয় বানরের উপমা দিয়েছিল, তার উপমাকে উদ্দেশ্য করে যুক্তির ভাষায় বলা যায়, কে সে? যে ছয় বানরকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছিল? কে লিখন-যন্ত্র সৃষ্টি করেছে? কে সেগুলোকে এক স্থানে একত্রিত করেছে? কে বানরের বয়স মিলিয়ন মিলিয়ন বছর বৃদ্ধি করেছে? কে এমন মজবুত লিখন-যন্ত্র দান করেছে, যা মিলিয়ন মিলিয়ন বছর একাধারে চলেছে? এবং এ মহা সময়ে সেগুলো না নষ্ট হয়েছে, না সংস্করণের প্রয়োজন পড়েছে। এত আঘাতের কারণে না পুরাতন হয়েছে, না ভেঙ্গে গেছে? কে তাদের কাগজ দিয়ে সহায়তা করেছে এবং তাতে কাগজ ঢুকিয়ে দিয়েছে? কে তাতে কালি ভরে দিয়ে সাহায্য করেছে? এবং এভাবে একনাগাড়ে সাহায্য করে গেছে? কে এই বানরগুলোকে বাধ্য করেছে বিরামহীনভাবে এত বছর ধরে লিখন-যন্ত্রে আঘাত করে যেতে? তাদের সাথে কি কোন পর্যবেক্ষক ছিল? যে তাদেরকে এ বিরামহীন কাজে বাধ্য করেছে? কে সে?

“কে” শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করলে নাস্তিকদের মুখ কালো হয়ে যায়, যা আগেও বলেছি।

তারপর মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে এ কাজ যখন শেক্সপিয়রের একটি কবিতা উৎপাদন করেছে অথবা তোমার ধারণায়- তার একটি সম্ভাব্য কবিতা উৎপাদন করেছে, তাহলে কত বছর লাগতে পারে তার সকল কবিতা প্রস্তুত করতে? কত বছর লাগতে পারে ইংরেজ কবিদের সকল কবিতা টাইপ করতে? এভাবে দুনিয়ার সকল কবিদের কবিতা টাইপ করতে কত সময় লাগতে পারে? কত সময় লাগতে পারে দুনিয়ার সকল সাহিত্যিকদের লেখা টাইপ করতে? কত সময় ? কত কাল? কত...?

আচ্ছা, যদি তোমরা বল, বিলিয়ন বিলিয়ন কপির মাঝে (যা একটা অমূলক কথা) একটি পাতা পাওয়া গেছে, যাতে শেক্সপিয়রের একটি কবিতা ছিল। তাহলে তোমার কথা এটা আবশ্যক করে যে, বিগ ব্যাঙের মাধ্যমে একটি জগত সৃষ্টির সাথে অবশ্যই বিলিয়ন বিলিয়ন জগত থাকতে হবে, থাকতে হবে বিলিয়ন বিলিয়ন সৃষ্টি, যা ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর বিলিয়ন বিলিয়ন এই নষ্ট কপিগুলোই প্রাধান্য বিস্তারকারী, স্বেচ্ছাচারী। তাহলে সেগুলো কোথায়??

অতএব বুঝা গেল তোমরা মিথ্যা বলেছ, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই সত্য বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿الملك: ١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿الملك: ٢﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿الملك: ٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿الملك: ٤﴾

“পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফেরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ-তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।” (সূরা মুলক: ১-৪)

কিছু নাস্তিক গর্ব করে দাবী করে যে, সেখানে আরো অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত জগত আছে, যেগুলো আমরা দেখতে পাই না। আমরা তাদের এমন ধারণা ও অনুমান ভিত্তিক কল্পনা থেকে দূরে থাকি। যে আল্লাহ নিজের অস্তিত্বের উপর প্রয়োজনীয় সব প্রমাণ পেশ করেছেন, তুমি যখন সে আল্লাহকেই বিশ্বাস করছ না, যেহেতু তিনি অদৃশ্য। তাহলে তুমি কিভাবে আমাদের ভিত্তিহীন বস্তুকে বিশ্বাস করতে বলছ?

আমাদের এ জগতে কোথায় সে বিলিয়ন বিলিয়ন সৃষ্টি এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত অস্তিত্বগুলো? কেন আমাদের বিবেককে হালকা করে দেখছ এবং আমাদের কাছে ধারণা-প্রসূত জগতের কথা বলছ? এটাই কি তোমার বৈজ্ঞানিক চিন্তার চূড়ান্ত সীমা।

এরপর তাকে বলা হবে, যে বলে, বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়ে বিগ ব্যাঙ এবং যান্ত্রিক ধারায় চলমান আছে। তোমাকে এ কথা বলা বেশি উপযুক্ত হবে, তুমি যে বিষয়টিকে গভীর দৃষ্টিভঙ্গি, গুরুগম্ভীর চিন্তা বলে দাবি করছ, তা শুধুই কিছু আওয়াজ, যা তোমার মুখ থেকে বের হয়েছে। অথবা কাগজের উপর কিছু অক্ষর, যা বিগ ব্যাঙ পদ্ধতিতে জমা হয়ে প্রকাশ পেয়েছে যেমনটা তুমি বলছ বা লিখছ। তার বাস্তবতা হচ্ছে খেল-তামাশা, তার কোন মূল্য নেই এবং কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্যও নেই। তুমি তা ইচ্ছাও করনি। বরং যে চিন্তাগুলো তোমার মাথায় আছে তা কেবল রাসায়নিক ক্রিয়া এবং যান্ত্রিক ছুটাছুটি। যা বিগ ব্যাঙের মত মস্তিষ্কের স্নায়বিক কোষে সৃষ্টি হয়েছে। তারপর সেটা এই অসার কথা জন্ম দিয়েছে।

তবে কি এই দীপ্তিমান হতভম্বকারী সুপ্রতিষ্ঠিত জগতটি বিগ ব্যাঙের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে? তোমার এই চিন্তা তো সৃষ্টি হয়েছে সতর্ক দৃষ্টি, সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি, নিশ্চিত মাধ্যম ও অপরিহার্য ফলাফল থেকে। তোমার চিন্তা এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যমূলক যা বাস্তবতার গভীরে চলে। তাহলে তোমার এ চিন্তা কেন জগত থেকে আলাদা হবে?

তারপর তাকে বলব, মনে করো, তোমার পকেটে একজন চোরের হাত প্রবেশ করল। সে চুপিসারে তোমার পকেটে হাত দিয়েছে। তুমি তার চুরি হাতে নাতে ধরে ফেললে। চোর যখন জানতে পারল, তুমি বিগ ব্যাঙে বিশ্বাসী। তাই সে বলল, আপনার পকেটে আমার হাত আকস্মিক ভাবে প্রবেশ করেছ। তখন কি তুমি তাকে বলবে? ধন্যবাদ! তুমি তো আমার দলের লোক? নাকি তাকে পুলিশে দিবে?

আচ্ছা, কেউ যদি প্রশ্ন করে, তাকে পুলিশে দিচ্ছ কেন? তখন তাকে কি বলবে? তুমি কি তাকে বলবে যে, এই চোরের উচিত বিচার পাওয়ার জন্য? যে কোন ভদ্রতা আর নীতি-নৈতিকতা বোঝে না। আচ্ছা, এটা তোমার কোন বিচার, কোন ভদ্রতা আর নীতি-নৈতিকতা?

এরপর আদালত হকদারের কাছে তার অধিকার পৌঁছে দেওয়ার জন্য চুরির মাল তলব করবে। তাহলে সে জগতে এটা কোন অধিকার? কোন হকদার? যেখানে সবকিছুই আকস্মিকভাবে ঘটে, যেখানে সবকিছুই তামাশার মাঝে খেলা করে?

তারপর আদালত একটি বিচার বাস্তবায়ন করে ভদ্রতা, আখলাক ও নীতি নৈতিকতা তৈরি করতে চাইবে। তাহলে সেটা কোন আখলাক, কোন নীতি নৈতিকতা? যখন প্রতিটি বস্তু আকস্মিক ও অন্ধকারে মিলে যায়? অথচ সেখানে তোমার কোন মূল্যায়ন ও আগ্রহ নেই? আছে শুধু আকস্মিকভাবে ঘটিত বিষয় ?

বিগ ব্যাঙ মতবাদের অনুসারী তর্কের খাতিরে বলতে পারে, বিচার আর আখলাক তো সেই বস্তু, যার উপর জ্ঞানীগণ একমত পোষণ করেছে। তখন আবার এ উত্তর আরো অনেক প্রশ্ন উস্কে দিবে। যেমন, জ্ঞানীগণ কিসের উপর একমত হয়েছে? তারা কি বিগ ব্যাঙ পদ্ধতিতে জগত সৃষ্টির উপর একমত হয়েছে? তারা কিভাবে একমত হয়েছে? ঐক্যবদ্ধভাবে মত দিয়েছে নাকি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সংখ্যাধিক্যের পদ্ধতি অনুসারে? যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হবে এটা- যে চোরের কথা আমরা আলোচনা করলাম, যদি তার সাথে আরো তিন চোর থাকে। তারা মরুভূমিতে আকস্মিক মতবাদের এক অনুসারীর দেখা পায়, যেখানে আর কেউ নেই। তাহলে তো অধিকার হিসেবে তারা তার মাল কেড়ে নিতে পারবে, ইচ্ছা করলে তার জামা-কাপড়ও নিতে পারবে। সেটাকে তারা সর্বোত্তম আকস্মিক ঘটনা মনে করবে অথবা মনে করবে শত পরিকল্পিত চুরি থেকে একটি আকস্মিক চুরি উত্তম।

অতঃপর আদালত বিবাদীদের মাঝে মীমাংসা করতে চাইবে। আর এর জন্য দরকার নিরপেক্ষ কর্তৃত্ব, যা মানবিক দুর্বলতা ও প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হবে না। বিদ্যমান বস্তুর মাঝে মীমাংসা করার জন্য ঝোঁক দ্বারা প্রভাবিত হবে না। এ বৈশিষ্ট্য শুধু মহান আল্লাহর মাঝেই আছে, যিনি সব ধরণের অপূর্ণতা থেকে পবিত্র।

তারপর কোন বিষয়ে বিচার করা, তাদের মতে- সেটা সে বিষয়ে কল্পনার শাখাগত বিষয়। এ কারণে বিচারক কোন বিষয়ে তখনই সমাধান করতে পারবেন, যখন সে বিষয়ের কল্পনা করবেন। তার কল্পনা বাস্তবতার যত নিকটবর্তী হবে, তার বিচার তত সঠিক হবে। বিপরীত হলে তার ফলও বিপরীত হবে। যেহেতু আস্তিক নাস্তিক নির্বিশেষ সকল মানুষ নিজের সম্পর্কে বে-খবর, বরং পুরা জগত সম্পর্কে তার জানার চেয়ে অজানার পরিমাণই ভয়াবহ পর্যায়ে। এ কারণে সঠিক সমাধানের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই ক্ষমতা রাখেন।

কারণ তিনি ইরশাদ করেছেন-

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾الملك: ١٤﴿

“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।” (সূরা মুলক: ১৪)

ষষ্ঠ যুক্তি: এভাবে আমি ঐ ব্যক্তিকেও বলব, যে বলে, এ অস্তিত্ব এবং জীবন সৃষ্টির বিষয়টি এমন যার কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই। তাকে বলব, তোমার এ কথা যেহেতু এই অস্তিত্বেরই একটি অংশ, তাই সেটাও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন অনর্থক বিষয় হিসবেই গণ্য হবে। যা কোন মজবুত মত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত চিন্তা নয়। বরং তা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন বেহুদা ও ফালতু প্রলাপ। এরপরও কেন আমরা দেখছি অতি উৎসাহের সাথে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করছ? এবং তা রক্ষার্থে বিরোধীদের সাথে তর্ক করে তোমার জীবনটা শেষ করে দিচ্ছ? যদি সব কিছুই অর্থহীন হয়ে থাকে, তবে কেন তোমার বিপরীত মতাবলম্বীদের অর্থহীন কাজে ছেড়ে দিচ্ছ না?

সপ্তম যুক্তি: এমনিভাবে যারা বলে, দৃশ্যমান জগতসমূহের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামী হিসেবে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, যার কোন লক্ষ-উদ্দেশ্য, ইচ্ছা ইত্যাদি কিছুই নেই। পর্যায়ক্রমে এ দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

তাদের উত্তরে বলব, তোমাদের যুক্তির এত দুর্বলতা যে, তা জবাব পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু একটি প্রশ্ন করি, যদি সেখানে অনেক জগত থাকে, যার একটি আরেকটি থেকে বিকশিত হয়েছ। তবে কি সেগুলো নিজেই নিজেকে বিকশিত করেছে, নাকি অন্য কেউ তা বিকশিত করেছে? করলে, তিনি কে?

উদাহরণস্বরূপ বলি, কোন প্রসিদ্ধ কোম্পানি প্রতি বছর কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের নতুন মডেল বের করে। যেমন, গাড়ি, কম্পিউটার, রেডিও ইত্যাদি। স্বভাবতই পরম্পরায় আসা পণ্যগুলোর মাঝে এক রকম সাদৃশ্যতা থাকবে। যেহেতু কোম্পানি প্রত্যেক পণ্যের উপর তার ট্রেড মার্ক বসায়। তবে কি পরম্পরা পণ্যগুলোর মাঝে সাদৃশ্যতার কারণে এটা বলা যাবে যে, প্রতিটি পণ্য তার পূর্বের পণ্য থেকে তৈরি হয়ে বিকশিত হয়েছে? নাকি এটা প্রমাণ করবে যে, উৎপাদনের ধরণ বা ক্যাটাগরি এক?

এর পরের কথা, যদি কোন চতুর পর্যটক এ কোম্পানির মালিকের কাছে আসে। বিচারকের সামনে তার বিরুদ্ধে বলে, এই পণ্যগুলো মজুত করে রাখার তার কোন অধিকার নেই। আইন করে ব্যবসায়িক সুবিধা লাভ করার অধিকারও তার নেই। কারণ এসব পণ্য পরস্পরে ধাক্কা, টক্কর আর সংঘর্ষ লেগে অন্ধের ন্যায় তৈরি হয়েছে। সেগুলো তৈরিতে কোন পরিকল্পনা, কোন ইচ্ছা ও লক্ষ্য ছিল না। কোন শ্রমও ব্যয় হয়নি। সে হিসেবে, এই পণ্যগুলোকে কোম্পানি এবং কোম্পানি মালিকের সাথে সম্পৃক্ত করা না করা দুটোই সমান। আবার সেই চতুর পর্যটকের সাথে তা সম্পৃক্ত করা না করাও সমান। তবে কি ঐ চতুর পর্যটকের দাবি কোন বিচারকের সামনে গ্রহণযোগ্য হবে? এমনকি বিচারক যদি ডারউইনের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ মতবাদের চরম বস্তুবাদী নাস্তিক হয়, তার কাছও কি গ্রহণযোগ্য হবে?

তাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কি জান্নাতে আদম আ. কে সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? তারপর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাকে দুনিয়ায় পাঠাতে সক্ষম নন? সেসময় জগতসমূহ বিকশিত থাক বা না থাক?

তাহলে তো আমাদের এবং তোমাদের মাঝে আসল সমস্যা হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে নিয়ে? যার অস্তিত্বকে তোমরা অস্বীকার করছ অথবা তাঁর গুণাবলিকে নিষ্ক্রিয় মনে করছ।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বের মাঝে এটাই মানুষের মূল সমস্যা ।

অষ্টম যুক্তি: যারা দাবি করে এ জগত পদার্থ দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে, তাদের বলব, সেই পদার্থগুলো কি?

বিজ্ঞান তো আবিষ্কার করেছে, পদার্থ হচ্ছে- যথা সম্ভব রুপান্তরশীল অর্জন ও পরিধি বিশিষ্ট দেহ। এভাবে অন্যান্য উপাদান কণা থেকে সৃষ্টি হয়। আর কণাগুলো সৃষ্টি হয় নেতিবাচক বৈদ্যুতিক শক্তি, কার্যকরণ প্রোটন, ভারসাম্যপূর্ণ নাইট্রোন ও বিভিন্ন শক্তি থেকে, যার একটি অপরটির সাথে মিলিত থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তি এগুলোকে চলার পথে নিয়ন্ত্রণ করে। এরপর আছে চার্জ, বিদ্যুৎ, বিভিন্ন তরঙ্গ, প্রকাশ ও অন্যান্য অজ্ঞাত শক্তি।

সেখানে আছে আলোককণা থেকে গঠিত আলো, যা কখনো দেহে রূপান্তরিত হয়, আবার কখনো তরঙ্গে। তারপর সেখানে আছে তাপ, যা গরম দেহ থেকে ঠাণ্ডা দেহে স্থানান্তরিত হয়। তারপর দেহের পিণ্ড বিলীন হয়ে যায়, আর প্রকাশ শক্তি দুর্বল হয়। তাপ গতিশীলতার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে- তাপ স্থানান্তরিত হয় গরম থেকে ঠাণ্ডায়, ফলে দেহসমূহ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

তাহলে কোন বস্তুটি তোমাদের সেই পদার্থ?

তাদের কেউ কেউ বলে, পদার্থ হচ্ছে অনন্ত।

তাদের কেউ কেউ বলে, পদার্থ ও সঞ্চলন দুটোই অনন্ত।

তাদের উত্তরে বলব, তোমরা অদৃশ্য বিষয়কে মানতে নারাজ, আবার তোমরাই অনেক অদৃশ্য বিষয়কে বিশ্বাস করতে বাধ্য হও। তাহলে কিসের ভিত্তিতে অবিনশ্বর চিরঞ্জীব অদ্বিতীয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে তোমরা অস্বীকার করতে যাও?

সুতরাং বৈজ্ঞানিক সূত্র, শক্তি, সঞ্চলন শক্তি, আকর্ষক শক্তি, তড়িৎ ও আকর্ষণ শক্তি, অনন্ত কাল, সীমাহীন পরিধি শুধুই কাল্পনিক বুঝ। যা তুলনা, প্রত্যক্ষ ও অনুভূতির নাগালের বাইরে।

অর্থাৎ সবই অদৃশ্য। তা সত্ত্বেও কোন নাস্তিক এটি অস্বীকার করতে দুঃসাহস করে না। কারণ তার সহকর্মীরা যে তাকে নির্বোধ বলবে।

ইনশা আল্লাহ, অচিরেই ড. আব্দুল ওয়াহহাবের "নাস্তিকতার আঁধার থেকে ঈমানের আলোয়" নামক কিতাবের আলোচনা আসছে। সেখানে আছে, তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক সূত্রই পেয়েছেন, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী দার্শনিকদের উক্তি, যেগুলো হয়তো অমূলক কথা অথবা একজন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পণ্ডিতের সাথে সেগুলোর কোন সম্পর্কই নেই।

তাদের আবারো বলি, আস্তিক নাস্তিক সকলেই একমত যে, এ জগতের অস্তিত্বশীল প্রতিটি বস্তু পরিবর্তনশীল। আর প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তুরই একজন সৃষ্টিকারী আছে। বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করে তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। আর অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে সেই সৃষ্টিকারী হচ্ছে অনন্ত পদার্থ।

এখানেই আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব, তোমরা যে পদার্থ বিশ্বাস কর, তা এ জগতের অস্তিত্বশীল সৃষ্ট পদার্থ কিনা?

যদি বলে, হ্যাঁ । তবে তো তা স্ববিরোধী বক্তব্য।

প্রথম স্ববিরোধীতা: এই পদার্থ এই পদার্থিক জগতের জাতীয় হওয়া মানে তা জগতের অংশ। আর জগতের অংশ হলে তা জগত সৃষ্টির আগে সৃষ্টি হতে হবে। এটা স্পষ্ট স্ব-বিরোধ।

দ্বিতীয় স্ববিরোধীতা: এই পদার্থ এই জগতের প্রকার হলে তার একটি সূচনা থাকতে হবে, যেটা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। সেটা পরিবর্তন ও বর্ধনশীল হতে হবে। আর নাস্তিক বলে, পদার্থ অনন্ত এবং প্রথম। এটাই তো তাদের মতবাদের সাথে সাংঘর্ষিক।

তৃতীয় স্ববিরোধীতা: এই পদার্থ এ জগতের প্রকার হলে মানতে হবে পদার্থ ধ্বংস হবে। কিন্তু নাস্তিক দাবি করে পদার্থ চিরস্থায়ী।

যদি বলে- না, পদার্থ এ জগতের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তা একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। তখন তো মানতে হবে, তা এ জগতের বিপরীত ভিন্ন কোন বস্তু। যার ব্যাপারে আমরা জানি যে, তা অস্তিত্বশীল হওয়া সম্ভব। তার একটি সূচনা ও সমাপ্তি আছে।

তখন তাকে বলব, তুমি আমাদেরকে অজ্ঞাত অদৃশ্য বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছ, অথচ অপরদিকে তুমি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে অস্বীকার করছ, অদৃশ্য হওয়ার কারণে।

তাদেরকে বলব, চিরস্থায়ী অনন্ত ও স্বতন্ত্র এই পদার্থগুলো জানার জন্য তোমাদের পদ্ধতিটা কি? যদি বল, প্রমাণ। তবে তো তোমার মতবাদের মাঝেই বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। কারণ তোমার দাবি, তুমি অনুভবযোগ্য এমন পদার্থকে বিশ্বাস কর, যা বুঝতে প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। এখন তোমাকে এ কথা বলতে হবে, তুমি এমন অদৃশ্য শক্তিকে বিশ্বাস কর, যাকে জানা যায় না এবং তা এ জগতের প্রকার নয়।

তাই ফলাফল দাঁড়াল, তুমি নিজের নফসের পূজা করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে অস্বীকার করছ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সত্যই বলেছেন-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿الجاثية: ٢٣﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿الجاثية: ٢٤﴾

"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না? তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।" (সূরা জাছিয়া: ২৩-২৪)

নবম যুক্তি: আমি নাস্তিককে এই সূত্রগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করব, যা জগতকে সুসংহত করে।

প্রথম প্রশ্ন: বস্তুসমূহের সূত্র থাকার অর্থ কি? এর উদ্দেশ্য কি এই বস্তুগুলোকে সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও একটি নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালনা করা?

আচ্ছা, তুমি একটি হাসপাতালে প্রবেশ করে দেখতে পেলে যে, সেখানে সকল কাজকর্ম একটি ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খল নিয়মে চলছে। তখন তুমি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে? এভাবে একটি বড় শহরে বিচরণ করে দেখতে পেলে যে, সেখানে যানবাহনগুলো নিয়মতান্ত্রিক সুশৃঙ্খলভাবে দ্রুত বেগে ছুটে চলছে। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ঘটছে না। তখন তোমার কি অনুভূতি হবে?

তুমি পরীক্ষা দিতে গিয়ে নির্ভুল, সুবিন্যস্ত, সুন্দর উপস্থাপনার সাথে পরিপূর্ণরূপে উত্তরপত্র লিখলে। আর তোমার এক সহপাঠী এলোমেলোভাবে এমন উত্তরপত্র লিখল, যার কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু পরীক্ষক তোমাদের দু'জনকেই এক নাম্বার দিল। তুমি এ ফলাফল গ্রহণ করবে নাকি এটাকে স্পষ্ট জুলুম বলবে? কারণ পরীক্ষক এখানে ভালো মন্দের মাঝে পার্থক্য করেনি, মেধাবী মেধাহীনের মাঝে পার্থক্য করেনি, পরিশ্রমী অলসের মাঝে পার্থক্য করেনি।

এ ফলাফল গ্রহণ না করলে, তবে বলতে হবে, এসব সূত্র হচ্ছে- প্রতিজ্ঞা, ইচ্ছা, প্রজ্ঞা ও পরাভূতকারী শক্তির একটি প্রভাব, যা তার নিম্নস্তরের বস্তুর উপর হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿يس: ٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿يس: ٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿يس: ٤٠﴾

“সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।” (সূরা ইয়াসীন: ৩৮-৪০)

দ্বিতীয় প্রশ্ন: যত সূত্র বা বিধি আছে, তার প্রত্যেকটি-ই কেউ না কেউ প্রণয়ন করেছে। আবার প্রত্যেক বিধির উপর আরেক বিধি থাকে, যা তার পরের বিধিকে সুসংহত করে।

যেমন, ফুটবল খেলার বিধি, এ বিধিতে আছে গোল এন্ট্রি, কর্নার শুট, ফাউল শুট ও থ্রু ইত্যাদি বিধি। এ বিধিগুলো কে প্রণয়ন করেছে? উত্তর, ফুটবল সংঘ। ফুটবল সংঘের নিয়ম

বা বিধি কে প্রণয়ন করেছে? উত্তর, আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফা অথবা যুব ও ক্রিয়া মন্ত্রণালয়।

যুব ও ক্রিয়া মন্ত্রণালয় এবং তার কর্মকর্তাদের দায়িত্বের বিধি কে প্রণয়ন করেছে? উত্তর, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ও কর্মকর্তাগণ। রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ও কর্মকর্তাদের বিধি কে প্রণয়ন করেছে? উত্তর, পার্লামেন্ট। পার্লামেন্ট বিধি কে প্রণয়ন করেছে? উত্তর, সংবিধান। সংবিধান কে প্রস্তুত করেছে? উত্তর, জাতীয় গণভোট। জাতীয় গণভোটের নিয়ম করেছে কে? উত্তর, গণ-প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়াজ। প্রতিনিধিদের আওয়াজের নিয়ম কে করেছে? উত্তর, ইনসাফ ও সঠিক বিচারের প্রতি তাদের আগ্রহ। তাদের মাঝে ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের আগ্রহ কে সৃষ্টি করেছে? উত্তর, তাদের বিবেক। তাদের বিবেকের কাজ বিকশিত করেছে কে?

এভাবে একের পর এক প্রশ্ন আসতে থাকবে।

তাই সর্বপ্রথম এমন একজন থাকতে হবে, যিনি সৃষ্টিকুলের জন্য বিধি দান করবেন। যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার উপর কারো হুকুম চলবে না। আর তিনি-ই হচ্ছেন চিরঞ্জীব অবিনশ্বর মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿المؤمنون: ٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿المؤمنون: ٨٩﴾

"বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহর। বলুনঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে?" (সূরা মু'মিনুন: ৮৮-৮৯)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন-

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ...﴿الشورى: ١٠﴾

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ।" (সূরা শূরা: ১০)

তাই তো আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হচ্ছে হাকিম তথা বিচারক। যেমনটি পূর্বোল্লেখিত হাদিসে এসেছে।

এখানে নাস্তিকদেরকে আরেকটি প্রশ্ন করব, জগত সুসংহতকারী এই সূত্রগুলো কে প্রণয়ন করেছে?

যদি বলে, এগুলো অনন্তকাল থেকে আছে। তার আগে কোন সূত্র প্রণয়নকারী ছিল না। তাহলে তো তুমি আমাদেরকে এমন অদৃশ্য শক্তি বিশ্বাস করতে বলছ, যা এ জগতের প্রকার নয়।

নাস্তিকের কাছে তৃতীয় প্রশ্ন: এই অনন্ত পদার্থ এবং প্রকৃতির নিয়মগুলো কি? যেগুলো জগতকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছে?

তাকে প্রশ্ন করি, সেগুলো কি অস্তিত্বে আছে? উত্তর অবশ্যই হবে, হ্যাঁ।

আচ্ছা, সেগুলো কি জীবিত? অবশ্যই উত্তর দিতে হবে, হ্যাঁ। কারণ তোমাদের ধারণায় যে বস্তু জগতকে জীবন দিয়েছে, তা মৃত হতে পারে না।

সেগুলো কি অন্য বস্তুর সৃষ্টিকারী ও রূপ দানকারী? উত্তর দিতে হবে, হ্যাঁ। তা কি জীবন দানকারী, মৃত্যু দানকারী? জবাবে বলতে হবে, হ্যাঁ। তা কি রিযিক দানকারী? জবাব হবে, হ্যাঁ। কারণ যিনি রিযিকদাতা তিনিই খাদ্য, পানি ও বাতাস প্রচুর পরিমাণে ঢেলে দিয়েছেন।

তারপর এই যে পদার্থ, তোমাদের ধারণায় তার থেকেই জগতের সৃষ্টি। আর বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, জগতের একটি সূচনা আছে। তাহলে তো এ পদার্থ অনস্তিত্বের উপর জগতের অস্তিত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ পদার্থ ইচ্ছাধিকারী। এমনটি নয় কি? জবাবে অবশ্যই হ্যাঁ বলতে হবে। তা কি অন্যের ইচ্ছার উপর কর্তৃত্ব করতে পারে? জবাবে বলতে হবে, হ্যাঁ। তা কি জ্ঞানী? বলতে হবে, হ্যাঁ। কারণ যদি জ্ঞানী না হয়, তাহলে কিভাবে সে আমাদেরকে জ্ঞান দান করেছে? তা কি রক্ষাকারী? বলতে হবে, হ্যাঁ। তা কি সবকিছু পরিচালনাকারী? বলতে হবে, হ্যাঁ।

আচ্ছা, সে বস্তু কি তোমার এই জামা, যা তোমার পরনে আছে? তোমার পায়ের মোজা? তোমার পকেটের কলম? জবাবে তো অবশ্যই বলবে, না। কারণ এসবই আরেকজনের কর্মের ফল। যার শুরু ও শেষ আছে ।

তাহলে তো এই শক্তি অবশ্যই এ জগতের অনুভূত বস্তুর বিপরীত কিছু। তাহলে অবশ্যই এই শক্তি বিদ্যমান, জীবন্ত, সৃষ্টিকর্তা, মহা সৃষ্টিকর্তা, রূপ দানকারী, জীবন দানকারী, মৃত্যু দানকারী, রিযিকদাতা, ক্ষমতাবান, প্রতাপশালী, বিধান দানকারী, ইচ্ছাধিকারী, বিজয়ী, জ্ঞানী, রক্ষাকারী, পরিচালনাকারী এবং অনুভূত বস্তুর বিপরীত।

তাই সৎসাহস থাকলে, জবানে উচ্চারণ করে বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

দশম যুক্তি: বস্তুবাদী চিন্তা জীবনের অনেক রহস্যের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।

সুতরাং জীবনের অনুভব ও অনুভূতিগুলো কি? মানুষই বা কেন এমন একক অস্তিত্বমান বস্তু, যে তার অস্তিত্ব ও পরিণতির কারণ জানতে চায়?

মানুষই বা কেন এমন একক অস্তিত্বশীল বস্তু, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান লিখে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম জ্ঞানের অঙ্গনে এগিয়ে যায়?

মানুষই কেন অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে? মানুষ কেন হৃদয়ে ভালো কাজের শক্তি পায়? মন্দ কাজের কারণে মন কেন পীড়া দেয়? কেন অপরাধ করলে তার মাঝে অপরাধের অনুশোচনা তৈরি হয়? ফলে সে মাজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া শান্তি পায় না।

পুণ্যের মর্ম কি? অভাবীকে সহায়তার মানে কি? মজলুমের পাশে দাঁড়ানোর অর্থ কি? মাতৃত্ব, পিতৃত্ব আর সন্তান হওয়ার অনুভূতিই বা কি? সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ কি? আমানতদারিতা, সততা, নিষ্কলুষতা ও বিশ্বস্ততাই বা কি?

এ জাতীয় সব বিষয়ের সামনে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অপারগ হয়ে থমকে দাঁড়াবে। কারণ এসবের না কোন রাসায়নিক ব্যাখ্যা হতে পারে, না পদার্থিক ব্যাখ্যা। কারণ পদার্থের জগত এমন এক জগত যেখানে শক্তিমান দুর্বলকে শেষ করে।

বরং সেখানে আরো অনেক পদার্থিক বস্তু আছে, যার ব্যাখ্যা দিতে স্বয়ং পদার্থ বিজ্ঞানই অক্ষম। যেমন, নিরেট একক বস্তু আঙ্গুলের ছাপ, চোখের তারা ও পরমাণু এসিড। মাছ ও পাখির জন্মস্থান থেকে বহুদূরে হিজরত।

কিন্তু কট্টর বস্তুবাদীরা তারপরও বলবে বিজ্ঞান অচিরেই এসবের বাস্তবতা উন্মোচন করবে। অথচ এটা অসম্ভব ধরণের অজ্ঞতা। হয়তো বিজ্ঞান কিছুতেই তা জানতে পারবে না। অথবা কিছু জানতে পারবে, আর কিছু অজানাই থেকে যাব। অথবা সে তা জানার উপযুক্ত নয়। যেমন, হাবাগোবা ব্যক্তি যদি হাজার বছর জীবনায়ূ পায়, তারপরও কি সে এসব নিয়ম নীতি বুঝতে পারবে?

তাহলে একটু চিন্তা করে দেখ তো, যে ব্যক্তি অব্যর্থ অভিজ্ঞতায় অর্জিত বিজ্ঞানের দাবি করে, সে কিভাবে আমাদেরকে অজ্ঞাত অদৃশ্য বিষয়ের দিকে ধাবিত করছে?

একাদশতম যুক্তি: নাস্তিককে বলব, তুমি দাবি করছ পদার্থের অস্তিত্ব গবেষণার আগে। এটাই আদি আর গবেষণা তার অনুগামী এবং তার একটি প্রভাব মাত্র। পদার্থ গবেষণার পূর্ব থেকে অনন্ত। তাকে বলব, আচ্ছা, তুমি কি তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছ? তুমি কি সে সময় উপস্থিত ছিলে, যে সময় পদার্থ ছিল কিন্তু গবেষণা ছিল না? এর উত্তর নিশ্চয়ই ‘না’।

তার কাছে প্রশ্ন, এ দাবির পক্ষে তোমার কাছে কি অনুভবযোগ্য অভিজ্ঞতাপূর্ণ কোন দলিল আছে? যা পঞ্চ ইন্দ্রীয়ের মাধ্যমে বুঝা যাবে? উত্তর দিবে, না। তাহলে কিসের মাধ্যমে তোমার মতের পক্ষে দলিল দিচ্ছ? এবার হয়তো উত্তর দিবে, প্রমাণ দিয়ে।

তাহলে তো পদার্থের অনন্ত হওয়া ও আদি হওয়া সাব্যস্ত করলে অনুভূত হওয়ার অযোগ্য দলিল দিয়ে। অথচ এই দলিল তোমার আকীদা-বিশ্বাস পরিপন্থী।

তারপর তুমি দাবি করছ, বিবেক, চিন্তা ও মমতা পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এসব বস্তুর কোন ওজন নেই, কোন আকার নেই। কারণ মানুষ যখন ঘুমায় অথবা মৃত্যুবরণ করে, তখন তার ওজনও কমে না এবং আকারেও কমতি আসে না।

তাহলে তুমি পদার্থ জাতীয় বস্তু থেকে অপদার্থিক বস্তু বের হওয়া সাব্যস্ত করলে। আর এটা তোমার বিশ্বাস পরিপন্থী। যেহেতু তোমার বিশ্বাস এ জগতের সবকিছুই পদার্থ।

আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী আলোচনা সামনের মজলিসে করার ইচ্ছা আছে, ইনশা আল্লাহ।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وآله وصحبه وسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

****